রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব
Politics and Personalities

ইউনিট-১

ভূমিকা

আধুনিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় রাজনীতি সর্বব্যাপী গুরুত্ব লাভ করেছে। সামাজিক সম্পদ ও সুবিধার বন্টন এবং সমাজকে পরিচালনার নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের সমন্বয় বিধানের আধুনিক প্রক্রিয়াই হ'ল রাজনীতি। বর্তমান যুগে রাজনীতি প্রধানত: সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র লাভ করেছে। কোন জনপদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও ইপ্সিত লক্ষ্যের সাথে সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত একত্রিত হ'য়ে সামাজিক শক্তিসমূহকে ক্রিয়াশীল করে। মানুষ এ সব শক্তির দ্বারা চালিত হয়। আবার, কোন কোন মানুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হ'য়ে এ সব সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিকেই নিয়ন্ত্রণ বা বিশেষ গন্তব্যে প্রবাহিত করে থাকেন। স্থান ও কালের সম্ভাব্য সকল প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা ক'রে এ সব মানুষের কেউ কেউ তাঁদের জনগোষ্ঠীকে অভীষ্ট লক্ষ্য পাইয়ে দিতে পারেন। এঁদের আসন তখন ঐসব জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে স্থায়ী হয় কালোত্তীর্ণ গৌরবের সাথে। তাঁরা একদিকে যেমন ইতিহাসের সৃষ্টি, অন্যদিকে আবার ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বও বটে। তাঁদের জীবন ও কীর্তি জানার সাথে সাথে সমসাময়িক ইতিহাসেরও অনেকখানি জানা হ'য়ে যায়।

বাংলাদেশের আধুনিক কালের ইতিহাসে স্থান সৃষ্টিকারী এ রকম কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রাসঙ্গিক জীবনকথা বর্তমান ইউনিটে আলোচিত হবে। জাতির তৎকালীন ও ভবিষ্যতের জীবনপ্রবাহ উপলব্ধির ক্ষেত্রে এ সকল জীবনালেখ্য অশেষ সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে কীর্তিমান যে সব ব্যক্তিত্বের জীবনকথা এই ইউনিটে সংক্ষেপে আলোচিত হবে তাঁরা হ'লেন :

- *পাঠ-১ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক।*
- *পাঠ-২ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।*
- *পাঠ-৩ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।*
- *পাঠ-৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।*

পাঠ-১

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

Sher-e Bangla A K Fazlul Huq

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ শিক্ষা বিস্তারে এ কে ফজলুল হকের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন ।
- ◆ কৃষক প্রজার মুক্তি দূত হিসেবে ফজলুল হক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ◆ রাজনীতিতে ফজলুল হকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

ফজলুল হক ছিলেন সাধারণ মানুষের দরদী বন্ধু।

বাঙালি জাতির গৌরব শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তার মহতী কর্ম ও অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের মাঝে। তিনি ছিলেন এদেশের কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মুক্তিদাতা। শিক্ষার আলো জ্বেলে এবং প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ করে সাধারণ মানুষের মুখে তিনি হাসি ফুটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের দরদী বন্ধু। এ দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজ যখন অশিক্ষা, দারিদ্র্য আর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত, তখন এই অধ:পতিত জাতিকে উদ্ধার করেন শেরে বাংলা ফজলুল হক।

জন্ম

শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বরিশালের রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং মাতার নাম বেগম সৈয়দুন্নেছা। তার পিত্রালয় ছিল চাখার নামক গ্রামে। তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে চাখার গ্রামে। ছাত্র জীবনে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। তিনি বহুমুখী এবং বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারে ফজলুল হকের অবদান

দেশের প্রবাহমান রাজনৈতিক ঘটনা থেকে ফজলুল হক উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা ছাড়া মুসলমান তথা বঞ্চিত মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকারবোধ ও স্বাধীন চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা বিস্ড়ারকে তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম কর্মোদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফজলুল হক শিক্ষা বর্জননীতি কখনও সমর্থন করেন নি। শিক্ষা বর্জন করলে পশ্চাৎপদ ও বঞ্চিত মুসলমান সমাজ আরো পিছিয়ে যাবে, শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে অধিকার বৈষম্য নীতির শিকার হবে, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারে ফজলুল হকের ভূমিকা সত্যই তুলনাহীন। বরিশালে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করেন এবং তিনি সেই কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে ফজলুল হক কলকাতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি (Central Muslim Educational Association) গঠন করেন। এই শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের শিক্ষাকে স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে কলকাতায় 'বেকার হোস্টেল' ও 'কারমাইকেল হোস্টেল' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই একক প্রচেষ্টায় উক্ত দু'টি ছাত্রাবাস থেকে লেখা-পড়া শিখেছেন এপার ও ওপার বাংলার বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। এ ছাড়া তারই প্রচেষ্টায় ইলিয়ট হোস্টেল, টেইলর হোস্টেল, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মুসলিম হোস্টেল এবং মুসলিম ইনস্টিটিউটের বিরাট ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি এ, কে, ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রীত্বের কাল ছয়মাস হলেও উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি কলকাতায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজই পরে ইসলামিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে এই কলেজটির নাম মৌলানা আযাদ কলেজ। ইতিপূর্বে মুসলমানদের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হতো না। ইসলামিয়া কলেজ প্রাতিষ্ঠার পর সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমান শিক্ষকদের এনে এই কলেজে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরেট স্থাপন করেন এবং একটি স্বতন্ত্র মুসলিম তহবিল গঠন করেন। তখন স্কুলসমূহে সংখ্যালঘু হিন্দুদেরই একাধিপত্য ছিল। মুসলমান ছাত্রদের স্কুলে ভর্তীর ব্যাপারটাও ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া মুসলমান ছাত্রদের সংস্কৃত পড়তে হতো। কারণ, সরকারী স্কুল ছাড়া অন্য কোন স্কুলে আরবি, ফার্সী পড়ানো হতো না। তিনি উপলব্ধি করলেন মফস্বল স্কুলে আরবি ও ফার্সী পড়ানোর ব্যবস্থা না করলে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে না। তাই তিনি আদেশ জারী করলেন কোন স্কুল সরকারী সাহায্য পেতে চাইলে একজন মুসলমান শিক্ষক ও একজন মৌলভী রাখতে হবে। তাই শিক্ষা দরদী ফজলুল হক মুসলমান ছাত্রদের জন্য সকল স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে রিজার্ভ সিটের ব্যবস্থা করলেন। এমন ব্যবস্থা করলেন যে মুসলমান ছাত্র পাওয়া না গেলেও রিজার্ভ সিট শূন্য থাকবে। এই ব্যবস্থার ফলে মুসলমানের শিক্ষা বিশেষভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিল। তাই বলে তিনি হিন্দু বিদ্বেষ পরায়ন ছিলেন না।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরেট স্থাপন করেন।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে আর একটি বাঁধা ছিল, পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার নিয়ম। যার ফলে হিন্দু শিক্ষকগণ মুসলমান নাম দেখলেই পরীক্ষার খাতায় ভাল লিখলেও অকৃতকার্য করিয়ে দিত। এতে মুসলমানদের পরীক্ষা পাসের হার ছিল অতি নগন্য, যার ফলে উপযুক্ত স্থান দখল করা তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের সমান বিচারের জন্য ফজলুল হক প্রবল প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধতা ব্যর্থ করে পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লিখার নিয়ম প্রবর্তন করেন। ফলে মুসলমান ছাত্রদের পাসের হার বাড়তে লাগলো।

ছয় মাস শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সময় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক মহামান্য আগা খান ও নবাব মোহসীন-উল-মুলক প্রমুখ 'আলীগড় এ্যাঙ্গলো ওরিয়েন্টাল' কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে একজন নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তা ছিলেন। উল্লেখ্য যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৭ সালে মুসলমানদের উন্নতমানের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রথমে আলীগড় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ফজলুল হক নব প্রতিষ্ঠিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের মত দেশরক্ষা বিভাগ নেওয়ার পরিবর্তে নিলেন শিক্ষা বিভাগ। এ দেশের সাধারণ মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি এ কাজ হাতে নিলেন। তিনি ছিলেন গণশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যাতে সমান অধিকার পায়, তার সঠিক নিয়ম প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চিত মুসলমানগণ যাতে শিক্ষার আলো দেখতে পায়, তার সুব্যবস্থা করা।

ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে কলকাতায় লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম শামসুন্নাহার মাহামুদকেও এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানরূপে তিনিই নিযুক্ত করেন। যদিও বেগম শামসুন্নাহার তখনও এম, এ ডিগ্রি প্রাপ্তা নন। কলকাতার বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলটি প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনাধীনে আনয়ণ করে তিনি স্কুলটির অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফজলুল হক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলার প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর তারই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ। এই সময় তার নিজ গ্রাম চাখারে তিনি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি সেখানে একটি মাদ্রাসা ও একটি হাইস্কুল তারই সৃষ্টি। রাজশাহীর আদিনা ফজলুল হক কলেজ, শর্ষিনা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য শেরে বাংলার দান অপরিসীম। তপশিলী সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য তিনিই প্রথম বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার উন্নতির জন্যে একে ফজলুল হকের অবদান বাঙালি জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

কৃষক-প্রজার মুক্তি দূত ফজলুল হক

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকগোষ্ঠী ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর তাদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য জমিদার, মজুতদার ও মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি করে। ফলে এই জমিদার ও মহাজন শ্রেণীই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের শক্তির প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রায় দু'শ' বছরকাল অত্যাচারী জমিদারের সহায়তায় ব্রিটিশ শোষকগোষ্ঠী এ দেশের সাধারণ কৃষক প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণের ষ্টিম রোলার চালায়।

ব্রিটিশ শোষকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে তহশীলদারগণ জমিদারশ্রেণীতে উত্তীর্ন হয়। জমিদারগণ ইচ্ছে মত খাজনা নির্ধারণ এবং আদায়ের সুযোগ পায়। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদার প্রজার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা খাজনা আদায় করতে পারত এবং ঔপনিবেশিক সরকারকে দিতো মাত্র তিন কোটি টাকা। কিন্তু জমিদার দ্বারা প্রজাপীড়ন রোধ করবার আইনগত কোন ব্যবস্থা না থাকায় জমিদার হয়ে ওঠেন একজন প্রভাবশালী রাজা। এই টাকা আদায় করার জন্য জমিদারগণ কৃষক-প্রজা পীড়ন, অনাচার ও অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছিলো। এরূপ অত্যাচার চলতে থাকে প্রায় দু'শত বছর যাবৎ।

শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জরিত অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ সৃষ্ট জমিদার, মহাজন, রাজা মহারাজাদের প্রতাপ প্রতিপত্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়। শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামের সূচনা করেন। তারই নির্দেশে খোশ মোহাম্মদ চৌধুরী ময়মনসিংহের জামালপুর মহকুমার কুমারচরে এক বিরাট কৃষক-প্রজা সাধারণের সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কৃষক প্রজাদের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক নিজে। সভাপতির ভাষণে তিনি কৃষক-প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তার আহবানে সাড়া দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল কৃষক প্রজাসাধারণ একতাবদ্ধ হয়। তখন থেকে মেহনতী জনগণের মধ্যে জাগরণের সাড়া পরিলক্ষিত হয়। এই আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যে বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা, কুমিল্লা এবং কুষ্টিয়াসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে উঠে এবং এ সময় তারই নেতৃত্বে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র জন্ম হয়। এই সমিতিই জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে।

শেরে বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে জমির উপর কৃষকের মালিকানা কায়েম করেন।

এই সময় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজাদের দেয় ঋণ সম্পর্কে জরিপ করা হয়। এতে দেখা যায়, জমিদাররা কৃষক-প্রজাদের কাছ থেকে তেষট্টি কোটি টাকা আদায় করতো। সরকারীভাবে আদায় দেখাতো মাত্র আঠারো কোটি টাকা এবং ব্রিটিশ সরকারকে তারা খাজনা হিসেবে দিতো মোট ছয় কোটি টাকা। তেষট্টি কোটি টাকা থেকে ছয় কোটি টাকা দিয়ে বাকী সাতান্ন কোটি টাকা জমিদার ও মহাজনরা আত্মসাৎ করতো। উপরোক্ত টাকা কৃষক-প্রজা সাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে আদায় করা হতো।

শেরে বাংলার নেতৃত্বে পরিচালিত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির উপরোক্ত জরিপে আরো দেখা যায় কৃষক-প্রজাদের ঋণের পরিমাণ চারশত কোটি টাকা। এই ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় চার-পাঁচগুণ। কৃষক-প্রজা সাধারণের উপর শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালের গৌরনদীর আগৈলঝরাতে এক বিরাট কৃষক-প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-প্রজা সম্মেলন করে কৃষকদের মুক্তির পথ প্রসারিত করেছিলেন।

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মহাজনী আইন পাস করে বাংলার কৃষক-প্রজাদেরকে মহাজনদের অত্যাচার, অনাচার এবং শোষণের রাহুমুক্ত করেন। কৃষককুলের মুক্তিদূত শেরে বাংলার নির্দেশেই ৬০ হাজার ঋণসালিশী বোর্ড স্থাপিত হয়। সারা দেশের জমিদার-মহাজন শ্রেণী উপরোক্ত আইনের বিরোধিতা করলেও শেরে বাংলার অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একই বছর শেরে বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন পাস করে জমির উপর কৃষকদের মালিকানা কায়েম করেন। ফলে কৃষকদের মুক্তিদূত শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের সুমহান নেতৃত্বে কৃষককুল তাদের হারানো জমি ফিরে পায়। কৃষকদের ওপর শাসন, শোষণ ও নির্যাতন চিরতরে অবসান ঘটে।

রাজনীতিতে শেরে বাংলার অবদান

শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন বিচিত্র ঘটনায় ভরপুর। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার মানুষ যখন চরম হতাশাগ্রস্থ তখন তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে নবাব স্যার সলিমুল-াহ ফজলুল হককে বিশ্বস্ড, যোগ্য ও শক্তিশালী সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার মহান ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দক্ষতা স্বল্পসময়ের মধ্যে তাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯১৩ সালে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৫ সালে তিনি কৃষক-প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালে স্বাক্ষরিত লৌক্ষ্ম প্যাক্ট ফজলুল হকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। ১৯১৮ সালে তিনি একদিকে মুসলিম লীগের সভাপতি অন্যদিকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। এ সময় তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে প্রচেষ্টা চালান। ১৯২৯ সালে তিনি 'নিখিল প্রজা সমিতি' গঠন করেন।

একে ফজলুল হক একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট মিমাংসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে শেরে বাংলা ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রজ্ঞা প্রদীপ্ত সুপারিশ করেছিলেন তার মধ্যে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ফজলুল হকের অসাধারণ নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে স্বাধীকারের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরই সূত্র ধরে পূর্ব বাংলার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে।

মৃত্যুঃ

সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে আপামর জনসাধারণের 'প্রিয় হক সাহেব' ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্তে জাতীয় তিন নেতার মাযারের মধ্যে তার কবরটি অন্যতম।

সারকথা: *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শুধু একটি নাম নয়, তিনি বাংলার প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মূল ইতিহাস। তিনি ছিলেন বাংলার কৃষককুলের প্রিয় 'হক সাহেব' এবং সাধারণ মানুষের অতি আপনজন। কৃষক প্রজার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্ড়রে ফজলুল হকের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মহান ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক পারদর্শিতা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. কোলকাতায় কেন্দ্রীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ?

ক. ১৯০৬;

খ. ১৯১২;

গ. ১৯১১;

ঘ. ১৯১৫।

২. ফজলুল হক কত সালে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ?

ক. ১৯১৯;

খ. ১৯২০;

গ. ১৯২১;

ঘ. ১৯২৪।

৩. আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন কে ?

ক. এ কে ফজলুল হক;

খ. স্যার সৈয়দ আহমদ খান;

গ. মৌলানা আবুল কালাম আযাদ;

ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

৪. কতসালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ?

ক. ১৯১৬;

খ. ১৯১৮;

গ. ১৯২১;

ঘ. ১৯৪৭।

৩. ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন

ক. মহাত্বা গান্ধী;

খ. জওহরলাল নেহেরু;

গ. এ কে ফজলুল হক;

ঘ মতিলাল নেহেরু।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. শিক্ষা বিস্তারে ফজলুল হকের অবদান আলোচনা করুন।

২. কৃষককুলের মুক্তির দিসারী ফজলুল হক-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ঘ, ৩. খ. ৪. গ, ৫. গ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. *আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫*

২. *মুহম্মদ আব্দুল খালেক, শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক*

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

পাঠ-২

Hossain Shaheed Suhrawardy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলার মুসলিম সমাজের অন্যতম অভিজাত পরিবারের সন্তান হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৮৯২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যার জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ও মাতা বেগম খুজিস্তা আক্তার বানু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরীক্ষক। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই দায়িত্ব পালন করেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পিতা ও মাতা উভয়ের বংশেই অসাধারণ খ্যাতিমান, শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ছিলেন।

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হতে বিএসসি ও আরবীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর অনন্য মেধার অধিকারী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বিলেতে যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বিএসসি ও আইনের সর্বোচ্চ বি.সি.এল ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়াও তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যারিস্টারীও সম্পন্ন করেন ১৯১৮ সালে। ১৯২০ সালে এত সব কৃতিত্ব লাভ করে যখন ভারতে ফিরে আসেন তখন তিনি ২৮ বছরের এক তরুণ শিক্ষিত বিদগ্ধ ভদ্রলোক।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেয়ার পর প্রধানত: শ্রমিক সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা গ্রহণ করতেন। প্রভূত খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি তিনি ভারতীয় মুসলমানদের শীর্ষনেতা আলী ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর ভক্ত ও অনুসারী হয়ে ওঠেন। খেলাফত আন্দোলন ও স্বরাজ আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে তিনি ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সান্নিধ্যে এসে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় অধিক দায়িত্ব পড়ে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সান্নিধ্যে এসে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ১৯২৮ সালে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম কনফারেন্স আয়োজিত হয়। এতে মুসলিম স্বার্থরক্ষায় তাঁর পেশকৃত যুক্তিপূর্ণ ভাষণ সবার প্রশংসা লাভ করে। একই বছর

তিনি কলকাতায় নিখিল ভারত খেলাফত সম্মেলনেরও আয়োজন করেন। এ সময় দিল্লীতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে পৃথক নির্বাচনের ফরমুলা গৃহীত হয় যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আসন নির্দিষ্ট থাকে। ভারত শাসনের জটিল সমস্যাদি নিরসনের জন্য ১৯৩৩ সালে লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান শেষে দেশে ফিরে সোহ্‌রাওয়ার্দী রাজনীতিতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি মুসলিম ইউনাইটেড পার্টি গঠন করেন।

ইতোমধ্যে শেরেবাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করার কারণে দলের সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ্‌ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে একই বছর মুসলিম লীগে যোগদান করান। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ-সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭-৪১ মেয়াদে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ দলীয় সরকারের বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী নিযুক্ত থাকাকালে সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলার খাদ্যাভাব মোকাবেলায় লঙ্গরখানা পরিচালনাসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন।

পাকিস্তান ইস্যুর উপর ভিত্তি করে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরিচালনায় মুসলিম লীগ বিজয়ী হলে তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ ভাইসরয় এককভাবে কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের নির্দেশ দিলে মুসলিম লীগের আহ্বানে ঐ বছর ১৬ আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঐ দিন দাঙ্গা বাধে। এরমধ্যে কলকাতা শহরের দাঙ্গা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যায় এতে। অক্লান্ত পরিশ্রমে সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দাঙ্গা রোধ করতে সক্ষম হন। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে তিনি বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভারতের শাসন ভার এককভাবে কংগ্রেসের হাতে দেয়া ঠিক হবে না। ১৫ অক্টোবর মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেয়।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে সোহরাওয়ার্দী প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি রোধ করতে ব্যর্থ হন। দেশ বিভাগের সময় কলকাতায় সংঘটিত দাঙ্গা প্রতিরোধে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে কাজ করেন। তিনি জানতেন, মহাত্মা গান্ধীর সাথে মিলে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য যে ভূমিকা পালন করছেন সেটিই সে সময় পাকিস্তান ও ভারতের মঙ্গলের জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ সালের নভেম্বরে কলকাতায় নিজ বাসভবনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কনভেনশন অনুষ্ঠানের পরের মাসে সোহ্‌রাওয়ার্দী করাচীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেষবারের মত যোগ দেন। তিনি তখন লীগের পরিবর্তে একটি জাতীয় দল গঠনের প্রস্তাব করলে তা উপেক্ষিত হয়। ভারতে ফিরে যাবার পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে অবস্থান করেন। ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা ও মসজিদসমূহ রক্ষা এবং পাকিস্তানের আর্থিক পাওনা পরিশোধের দাবীতে মহাত্মাজী তখন অনশন করছিলেন। ভারত সরকার তাঁর দাবী মেনে নেয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারী দিল্লীর বিড়লা পার্কের এক প্রার্থনা সভায় একটি ধর্মান্ধ হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনের হাতে গান্ধীজী নিহত হলে সোহ্‌রাওয়ার্দী মুষড়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এরপর সরকারের কারসাজিতে আয়কর সংক্রান্ত এক অন্যায় মামলায় তাঁর সহায় সম্পদ আটক করা হয়।

পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট তৈরী হয়।

সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় আগমন করলেও বিচলিত মুসলিম লীগ নেতাদের ষড়যন্ত্রে তিনি স্টীমার থেকে নামতে না পেরে নারায়নগঞ্জ থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এরপর ১৯৪৯ সালের মার্চে করাচীতে তাঁর শ্বশুরালয়ে গমন করেন। 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল গঠিত হয় এ বছর ২৩ জুন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে দলের নিখিল পাকিস্তান সংগঠন গঠিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫৪-র সাধারণ নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানীকে সাথে নিয়ে দৃঢ় প্রচারণা চালান। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনেন। বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়।

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী হলে পাকিস্তানে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সামরিক আইনের অধীনে জারীকৃত Elective Bodies Disqualification Order (EBDO) অনুযায়ী সোহ্‌রাওয়ার্দী রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষিত হন। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারী তিনি গ্রেপ্তার হন। সেনানায়ক প্রেসিডেন্ট আইউব খান সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত শক্তিশালী নেতাকে রাজনীতিতে রেখে নিরাপদ বোধ করেন নি।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুপ্রেরণায় পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট তৈরী হয়। ১৯ আগষ্ট তারিখে মুক্তিলাভের পর তিনি প্রায় এক বছর অবিশ্রান্তভাবে জনসংযোগ করেন গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য। এরপর সোহ্‌রাওয়ার্দী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জুরিখে গমন করেন। দেশে ফিরবার পথে বৈরুতে অবস্থানকালে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর একটি হোটেলে আত্মীয়-পরিজনহীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঢাকার রমনা রেসকোর্সের দক্ষিণপ্রান্তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে ময়দানটি তাঁর নামানুসারে 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান' নামে পরিচিত।

সারকথা: *হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও শিক্ষিত মানুষের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের তিনি 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' নামেই পরিচিত। রাজনীতিতে মানবিক মূল্যবোধ ও মেধার গুনুত্ব বিবেচনায় তিনি কোন আপোস করেন নি। দেশপ্রেম, মানব-কল্যাণ ও গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এ দেশের রাজনীতিতে ধ্রুবতারার জ্যোতি নিয়ে বিরাজ করতে থাকবেন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্ম------
(ক) ১৮৭৩ সালে; (খ) ১৮৭৬ সালে; (গ) ১৮৯২ সালে; (ঘ) ১৯০৬ সালে।

২। সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্মস্থান ------
(ক) ঢাকা; (খ) করাচী; (গ) কলকাতা; (ঘ) বোম্বাই।

৩। সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন -------
(ক) ১৯০৬ সালে; (খ) ১৯১৩ সালে; (গ) ১৯২১ সালে; (ঘ) ১৯২৮ সালে।

৪। সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৩৬ সালে যোগ দেন ----------
(ক) কংগ্রেস দলে; (খ) খেলাফত আন্দোলনে; (গ) মুসলিম লীগে; (ঘ) বেঙ্গল পার্টিতে।

৫। ১৯৪৩ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী যে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন -------
(ক) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর; (খ) বেসামরিক সরবরাহ; (গ) স্বরাষ্ট্র; (ঘ) পররাষ্ট্র।

৬। মহাত্মা গান্ধী নিহত হন ১৯৪৮ সালের ------
(ক) ১ লা জানুয়ারী; (খ) ২০ জানুয়ারী; (গ) ১১ সেপ্টেম্বর; (ঘ) ২০ মার্চ।

৭। সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ------
(ক) জানুয়ারী ১৯৫৪; (খ) ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫; (গ) আগষ্ট ১৯৫৬; (ঘ) সেপ্টেম্বর ১৯৫৭।

৮। সোহ্‌রাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন --------
(ক) কলকাতায়; (খ) বোম্বাইয়ে; (গ) বিহারে; (ঘ) বৈরুতে।

৯। সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সবাই চেনেন যে নামে ------
(ক) গণতন্ত্রের মানসপুত্র; (খ) ইতিহাসের রূপকার; (গ) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সূত্র; (ঘ) বাংলার সপ্নদ্রষ্টা।

১০।সোহ্‌রাওয়ার্দীর সমাধি কোথায় ?
(ক) বৈরুতে (খ) বোম্বাইয়ে (গ) বাহরাইনে (ঘ) ঢাকায়।

উত্তর : ১. গ, ২. গ, ৩. গ, ৪. গ, ৫. খ, ৬. খ, ৭. ঘ, ৮. ঘ, ৯. ক, ১০. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *খন্দকার আব্দুর রহিম শতাব্দীর জননেতা মাওলানা ভাসানী, খন্দকার প্রকাশনী, ১৯৯৩ টাঙ্গাইল।*
২। *কালীপদ দাস, সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ১৯৯২।*

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani

পাঠ -৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ মাওলানা ভাসানীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা বলতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভাসানীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

কোন কোন মহান ব্যক্তির নামের সাথে বিশেষণ জুড়ে যায়। তখন তাঁকে ওই বিশেষণ থেকে বিযুক্ত করা চলে না। রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নামের আগে বিশেষণ হল 'মজলুম জননেতা'। আব্দুল হামিদ ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উদার ও আদর্শ দরিদ্র, ভদ্রলোক হাজী শরাফত আলী ছিলেন তাঁর পিতা। হামিদ খানের বয়স ছয় বছর হলে পিতার মৃত্যু হয়। হামিদের বয়স যখন এগারো বছর তখন তার মায়ের মৃত্যু হয়। চাচার অনুগ্রহে মাদ্রাসায় ভর্তি হলেও লাঠি খেলা, গান গাওয়া, বক্তৃতা নকল করা ইত্যাদি গুণের কারণে দ্রুত তার কিছু গুণগ্রাহী জুটে যায়। ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে এই যুবকের মনোভাবে শঙ্কিত জমিদারদের সম্ভাব্য অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য স্নেহশীল শিক্ষক মাওলানা আব্দুল বাকি তাকে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পাঠিয়ে দিলেন।

আব্দুল হামিদ জ্ঞান অন্বেষণ ও মানুষের সেবার মোহে আকৃষ্ট হয়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকলেও আসামের গোয়ালপাড়ায় পীর নাসির উদ্দীন বোগদাদীকে খেদমত ও তাঁর কাছে অগাধ জ্ঞান আহরণ করে 'মাওলানা' আখ্যা লাভ করেন। আসামের গরীব মানুষদের সাথেও তার নিবিড় পরিচয়ের পর কলকাতায় মহাত্মা, দেশবন্ধু, নেতাজী প্রমুখের সংস্পর্শে এসে তাঁদের দেশপ্রেমে অভিভূত হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর আগে তিনি মাওলানা মনিরুজ্জামান ও আকরাম খাঁ-র মত নেতার সংস্পর্শে এসে মুসলিম লীগেও যোগদান করেন। ১৯০৮ সালে আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি, ১৯১৫ সালে আসাম আঞ্জুমানে ওলামার সভাপতি ছিলেন। আবার ১৯১৬ সালে আসাম কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। আব্দুল হামিদ খান আসামের সমসাময়িক রাজনীতিতে একজন অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আসামেও জমিদার-প্রজা বা শোষক-শোষিতের সংঘাত ছিল। মাওলানা সাহেব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছেই তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে পীর হিসেবে নন্দিত হয়েছেন। কিছুদিন নৌকাবাসের সময় তিনি ধূবড়ীর কাছে ভাসানচরে নামেন। সেখানে তিনি চরের মানুষদের অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হয়ে নিজের নামের সাথে 'ভাসানী' অভিধাটি সংযুক্ত করেন।

১৯২২ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান শেষে আসামে ফিরে "লাঙ্গল যার জমি তার" শে-াগান তুললেন।

ভাসানী ১৯১৯ সালে কিশোরী কৃষককন্যা আলেমা বিবিকে বিয়ে করেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান শেষে আসামে ফিরে "লাঙ্গল যার জমি তার" শে-াগান তুললেন। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গ আসাম কৃষক প্রজা সম্মেলন আহ্বান করে শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদেরকে সংগঠিত করতে থাকলেন। ইতোমধ্যে মাওলানা দু'বার জেলে গেছেন। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দুর্বার বাসনা যে ক'জন মনীষীর চেষ্টায় প্রসার লাভ করে, মাওলানা ভাসানী তাদের অন্যতম। ১৯৩৭ সালের আসাম প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। কংগ্রেস সরকার এমন এক আইন পাশ করেন যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আসামের বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে অবশিষ্ট বাঙ্গালীদেরকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। ভাসানী এই 'লাইন প্রথা' ও 'বাঙ্গাল খেদাও আন্দোলন' এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আসামের ৩৪টি আসনের মধ্যে ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ ৩১টিতে বিজয়ী হন। আসামের শাসকগণ পুনরায় বাঙ্গালী মুসলমানদের বিতাড়ণের ব্যবস্থা নেন। ধুবড়ীতে 'বঙ্গ আসাম ন্যাশনাল গার্ডের' বিরাট সমাবেশ ও এক লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা করে ভাসানী গর্জে উঠলেন এর বিরুদ্ধে। ভাসানীকে গ্রেপ্তার করা হলেও তুমুল আন্দোলনের ফলে শাসকরা মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তার শেষটুকুও চলে যায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে।

১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকায় মুসলিম লীগের এক কর্মী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। টাংগাইলের এক উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগের শক্তিশালী প্রার্থীকে পরাজিত করলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পাদক শামসুল হক। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তার শেষটুকুও চলে যায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে ভাষার মর্যাদা দাবীকারী নিরস্ত্র মানুষের উপর সরকারের নির্মম হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে। এ সময় ভাসানীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ মাস পর ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও অন্য কয়েকটি দল মিলে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। শেরেবাংলা ও ভাসানী এতে কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হন। ১৯৫৪ এর ৮ মার্চের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি আসনের মধ্যে ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগের ১৪৩ টিসহ যুক্তফ্রন্ট মোট ২২৩টিতে জয়ী হয়। এদিকে, ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের "মুসলিম' অভিধা অবলোপ করা হয়। দলের নিখিল পাকিস্ড়ান সংগঠনের প্রধান হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী কর্তৃক ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর তার সাথে পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে ভাসানীর মতান্ড়র প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৫৭-র ৭-৯ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে দলের সম্মেলনে বিভাজনটি স্পষ্টতর হয়। ঐ বছর ১৮ মার্চ তিনি দল থেকে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। অত:পর একই বছরের ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির' আয়োজন করে বাম ধারার 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। ১৯৫৮-র সেপ্টেম্বরে প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকারের মৃত্যু ঘটে। কয়েকদিন পর দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়। কোন অভিযোগ ব্যতিরেকেই গৃহবন্দী হিসেবে ৪৪ মাস ভাসানী অন্তরীণ থাকেন।

১৯৬২ সালে অনেক বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ভাসানীর সাথে যোগ দিলে প্রদেশে বহু কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এরপর তিনি গণচীন সফর করে পাকিস্তানের সাথে চীনের বন্ধুত্বের ভিত্তি রচনা করেন। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী থাকাকালে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের শূন্যতা তিনি প্রায় এককভাবে পূরণ করেন। ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে ভাসানী জোরালোভাবে স্বাধীন পূর্ব বাংলার কথা বলেন। '৬৯-এর আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। লাহোরের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যোগ দিতে অসম্মতি জনান। ১৯৭০ সালে

সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রেখে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরংকুশ বিজয় নিশ্চিত করেন। ইতোমধ্যে ১২ নভেম্বর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পূর্ববাংলার উপকূলভাগে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ও প্রদেশব্যাপী খাদ্যাভাবের দিকে তিনি মনোযোগ দেন।

১৯৭১-এর মার্চে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ববাংলার সংগ্রাম শুরু করেন ও ইয়াহিয়া খানকে এই স্বাধীন দেশের স্বীকৃতিদানের আহবান জানান। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ভাসানী ভারতে গমন করেন। ভারত সরকার তাঁকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখে। ভাসানী দেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ এর ২২ জানুয়ারী।

১৯৭৪ সালের এপ্রিলে তাঁর নেতৃত্বে বিরোধী রাজনীতিকরা ছয়দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পর ভাসানীকে ৩০ জুন সরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তোষে রেখে আসে। সেখানে তিনি কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ভাষানী ক্রমশ: রাজনীতিতে নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ১৬ মে তিনি আরেকটি যুগান্তকারী কাজ করলেন। পদ্মার পানি প্রবাহে ভারতের বিঘ্ন ঘটানোর প্রতিবাদে ঐতিহাসিক 'ফারাক্কা মিছিল' সংগঠিত করেন। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় ভাসানীর বক্তৃতাশেষে জনগণ তাঁকে সামনে নিয়ে সীমান্তবর্তী কানসাটে যায়। এরপর মওলানার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। লন্ডনে চিকিৎসা করা হলেও তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার হয় নি। ১৯৭৬ এর ১৭ নভেম্বর রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সারকথা: *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কৃষক শ্রমিক মেহনতী সাধারণ মানুষের জন্য জীবনভর রাজনীতি করেছেন। সাধারণ মানুষের ভাষায় সাধারণ মানুষেরই উপযোগী জীবন-যাপন করে তিনি অকুতোভয়ে ন্যায্য কথা বলে গেছেন। দূরদর্শিতা ও মানুষের জন্য মমত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে স্পষ্ট কথা বলবার কারণে সমাজের গণ্যমান্য কেউ কেউ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন। কিন্তু জনগণের কাছে তিনি চিরকাল রয়ে গেছেন অবিসম্বাদিত নেতা। ইতিহাসে তাঁর এ আসন অমলিন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। মাওলানা ভাসানী কবে জন্মগ্রহণ করেন ?

(ক) ১৯১৭ সালে; (খ) ১৯০৬ সালে; (গ) ১৮৮০ সালে; (ঘ) ১৮৭৩ সালে।

২। আবুল হামিদ খানের পিতার নাম ----------

(ক) শওকাত হায়দার খান; (খ) সাদাত আলী; (গ) শরাফত আলী; (ঘ) অজ্ঞাত ব্যক্তি।

৩। ভাসানচরের অবস্থান --------

(ক) টাঙ্গাইলে; (খ) ধুবড়ীতে; (গ) সিরাজগঞ্জে; (ঘ) গাইবান্ধায়।

৪। আসামে ভাসানীর গে-াগান ছিল -------

(ক) ভাত চাই ভোট চাই; (খ) ব্রিটিশরাজ ভারত ছাড়; (গ) অবাঙ্গালী খেদাও; (ঘ) লাঙ্গল যার জমি তার।

৫। আসামে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ছিল ---------

(ক) বেগার খাটানো; (খ) লাইন প্রথা; (গ) জেল-জুলুম; (ঘ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

৬। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে ভাসানী তাতে কোন পদ গ্রহণ করেন ?

(ক) সভাপতি; (খ) সম্পাদক; (গ) যুগ্ম-সম্পাদক; (ঘ) প্রচারক।

৭। আওয়ামী লীগের নীতি-নির্ধারণ বিষয়ে বিতর্কের জন্য ভাসানী আহুত সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

(ক) লাহোরে; (খ) ঢাকায়; (গ) কাগমারীতে; (ঘ) পাঁচবিবিতে।

৮। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয় ------

(ক) ২৬ জুলাই ১৯৫৭; (খ) ২৪ জুন ১৯৪৯; (গ) ৭ জুন ১৯৬৮; (ঘ) ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬।

৯। ভাসানী ফারাক্কা মিছিল সংগটিত করেন ----------

(ক) ৭ জুন ১৯৬৬; (খ) ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২; (গ) ৭ মার্চ ১৯৭৩; (ঘ) ১৬ মে ১৯৭৬।

১০। ভাসানীর মৃত্যু হয় ------

(ক) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৫; (খ) ৩১ মে ১৯৮১; (গ) ১৭ নভেম্বর ১৯৭৬; (ঘ) ২৩ মে ১৯৭৬।

উত্তর : ১. গ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ঘ, ৫. খ, ৬. ক, ৭. গ, ৮. ক, ৯. ঘ, ১০. গ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *হাসান আব্দুল কাইয়ুম (সম্পাদিত), মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী, ঢাকা ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।*
২। *খন্দকার আব্দুর রহিম, শতাব্দীর জননেতা মাওলানা ভাসানী, খন্দকার প্রকাশনী, টাঙ্গাইল, ১৯৯৩।*

পাঠ-৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনালেখ্য বিবৃত করতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিবৃত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়। সময় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। জন্মস্থান ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর মা সাহেরা খাতুন গৃহবধু। পিতা শেখ লুৎফর রহমান। পিতা ছিলেন জেলা জজ আদালতের সেরেস্ড়াদার। কিশোর মুজিবের সাহসিকতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ১৯৩৯ সালে। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেরেবাংলা একে ফজলুল হক গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে গেলে স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের পথ রূদ্ধ করে স্কুল বোর্ডিং এর ছাদ মেরামত করার দাবি করেন। এ ভাবে মুজিবের রাজনীতির হাতেখড়ি হল বাংলার প্রবাদপ্রতিম দুই নেতার কাছে।

১৯৪২ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সম্পাদক স্পষ্টবাদী, সাহসী ও উদ্যমী মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় বেকার হোস্টেলে থাকতেই অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের কারণে সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আস্থা অর্জন করেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলার কর্মভার দলের পক্ষ হতে তার উপর অর্পিত হয়। ইতোমধ্যে তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

মুসলীম লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

মুজিবসহ কয়েকজন ছাত্রনেতার উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের' জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র 'উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' করার ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় ভূমিকা রাখেন। সরকার তাঁকে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পরবর্তীতে একই বছর ১১ সেপ্টেম্বর জেলে পাঠায়। ঢাকার রোজ গার্ডেনে ১৯৪৯ এর ২৩ জুন প্রধানত: মুসলীম লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। কারাবন্দী অবস্থায় বঙ্গবন্ধু দলের

যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ এর ফেব্রুয়ারীর শেষে মুক্তির পর মুজিব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলামী, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও গণতন্ত্রী দল ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা, 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। নির্বাচনে পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ টি আসন লাভ করে। সরকারি দল মুসলিম লীগ পায় মাত্র নয়টি আসন। একজন কোটিপতি মুসলিম লীগ নেতার বির"দ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেরো হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন। তিনি ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় গণপরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব এ সময় 'কেন পূর্ববঙ্গের অটনমি চাই' শীর্ষক এক পুস্ড়িকা আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে প্রকাশ করে পূর্ব বাংলার উপর উপনিবেশিক শোষণ ও পশ্চিম পাকিস্ড়ানের বাজারে পরিণত করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করতে শুর" করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে দলের নাম হতে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেওয়ার প্রস্ড়াব আনলে প্রায় সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে সামরিক আইন জারী করেন। বিশ দিন পর সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান তাকে পদত্যাগে বাধ্য করে এবং নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নীল-নকশা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি 'মৌলিক গণতন্ত্রী' সংবিধান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রবর্তিত হয়। সামরিক আইন জারীর সাথে সাথে মুজিবকে গ্রেফতার এবং ১৪ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান। 'Electoral Bodies Disqualification Order (EBDO)'-র অধীনে সোহ্রাওয়ার্দী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রাজনীতির অযোগ্য ঘোষিত হলেন। ১৯৬২-র ২৪ জুন মুজিবসহ পাকিস্তানের নয়জন নেতা ঘোষণা করেন যে, গণপ্রতিনিধি ছাড়া আর কেউ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার রাখেন না। মুজিবের প্রস্তাবক্রমে ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি দলকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। পার্লামেন্টারী ধরণের গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার দাবী উত্থাপিত হয়।

শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও পরবর্তী তাসখন্দ চুক্তির প্রেক্ষাপটে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক নেতারা ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক জাতীয় সম্মেলন আহবান করলে বাঙালির জাতীয় মুক্তি ও পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সভায় তাঁর ঐতিহাসিক "ছয় দফা" কর্মসূচি উত্থাপন করেন। কর্মসূচিটি ১৮ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্ড়ান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে "আমাদের বাঁচার দাবী- ছয় দফা কর্মসূচী" শিরোনামে ব্যাখ্যাসহকারে বিলি করা হয়।

১৯৬৮ সালের ১৯ জানুয়ারী প্রায় দু'বছর কারাবাস শেষে মুক্ত হয়ে বেরুতেই আইয়ুব সরকার ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে শেখ মুজিব ও আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা দায়ের করে। অভিযোগ, এরা ভারতের আগরতলায় বসে ভারত সরকারের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ এর ২৮ জানুয়ারী এক দীর্ঘ জবানবন্দীতে তাঁর সংগ্রামী নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও পূর্ব বাংলার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষা ও বঞ্চনা এবং অপশাসনের বিষয়ে নিজের ও তাঁর দলের দৃষ্টিভংগির বিবরণ দেন।

গণআন্দোলনের শক্তি বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১৯ ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। ২২ ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও মুজিবসহ সকল আসামীকে মুক্তি দেয়া হল। পরদিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের

আহ্বানে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। এক সামরিক অভ্যুত্থানে ২৫ মার্চ আইয়ুবকে অপসারণ করে সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হন। তিনি কঠোর হাতে জনশৃ খলা রক্ষা ও যথাশীঘ্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংকল্প ব্যক্ত করেন।

ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ এর ৩০ মার্চ 'আইনগত কাঠামো আদেশ' জারী করে জানান যে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু ২৮ অক্টোবর রেডিও ও টেলিভিশনে এক ভাষণে পূর্ব বাংলার প্রতি অবহেলার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর দলের কর্মসূচীর রূপরেখা তুলে ধরেন। কয়েকদিন পর ১২ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আনুমানিক দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জনগণকে পূর্বাভাস দেয় নি, মানুষকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে নি, এমনকি ত্রাণকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রেও গুরুতর অবহেলা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দুর্গত মানুষের সেবায় ঝাপিয়ে পড়ে শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তাদেরকে ধিক্কার দেন। এরূপ প্রেক্ষাপটে ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার জন্য জাতীয় পরিষদের ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টিতে জয়ী হয়। মহিলা আসনসহ পূর্ব বাংলার মোট ১৬৯টি আসনে মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হয়ে এই দল জাতীয় পরিষদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি লাভ করে।

১৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ এর ৩রা জানুয়ারী রমনা রেসকোর্সে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণের 'শপথ গ্রহণ' অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১১ জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার পর তাঁকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে অভিহিত করেন। তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন যে, পাকিস্ড়ানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ভূট্টো বলেন যে, তার দল অধিবেশনে যাবে না, কারণ ঢাকায় যাবার পর তিনি ও তার সহকর্মীগণ 'জিম্মী' হয়ে পড়বেন। পয়লা মার্চ দুপুরে পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। বঙ্গবন্ধু পরদিন ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ সারাদেশে সর্বাত্নক হরতাল আহ্বান করলেন এবং তিনি ৭ মার্চ তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন বলে জানান।

২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসমাজ বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে এবং সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করে। ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে পূর্ব বাংলার সকল দপ্তরে তালা লাগে। ব্যাংক, বিমান, ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেলপথ সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর উপর প্রবল চাপ ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। এমনি অবস্থায় ৭ মার্চ ১৯৭১ রমনা রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যই এবারের সংগ্রাম পরিচালিত হবে। সংগ্রাম কমিটি গঠন ও যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানান তিনি। সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, হত্যাকান্ডের তদন্ত ও জনপ্রতিনিধিগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলেই তবে তিনি বিবেচনা করবেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়া যাবে কিনা।

১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এদিন ঢাকায় এলেন। ২২ ও ২৩ মার্চ গুঞ্জরিত হয় যে, মুজিব-ইয়াহিয়া সমঝোতা হতে যাচ্ছে। কিন্তু মুজিবকে না জানিয়েই ইয়াহিয়া ২৫ এর রাতে ঢাকা থেকে ফিরে যাবার আগে তার কমান্ডারদেরকে বাঙ্গালি নিধনের নির্দেশ দিলেন। গর্জে উঠলো সৈন্যদের মারণাস্ত্র। বঙ্গবন্ধু মাঝরাতের পর অয়্যারলেসে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাঠিয়ে দিলেন চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানীদের নৃশংসতা রোধের ও বাঙ্গালীদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের আবেদন করলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে। সুদীর্ঘ নয় মাস বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে কায়েম করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুকে বাইরের পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী রেখে গোপনে তাঁর বিচারের প্রহসন চালানো হয়। তাঁকে পৃথিবী হতে সরিয়ে দেয়াই ছিল তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু স্বাধীন জাতির মহানায়ক হিসেবে তিনি ১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারী দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। দেশে ফিরেই সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র ৬৭ দিনের মধ্যে তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করলেন। তিনি দ্রুত একটি সংবিধান প্রবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করেন। বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকীতে গণপরিষদ জাতিকে একটি উৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দেয়। পাকিস্তান হতে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালির প্রত্যাবর্তন ও তাদের পুনর্বাসন, দেশে শান্ড়ি শৃঙ্খলা রক্ষা, হাজার হাজার অস্ত্র উদ্ধার, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ন, আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি ও সহায়তা সংগ্রহ ইত্যাদি দুরূহ কাজে বঙ্গবন্ধুকে দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয়েছে। একটি জাতির মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বদানের জন্য বিশ্ব শান্ড়ি পরিষদের কাছ থেকে তিনি জুলিও কুরী পুরস্কার পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মানুষকে অন্ধভাবে ভালোবেসে নিজের নিরাপত্তার কথা উপেক্ষা করেছেন। তাঁর অনুগৃহীতদের সবার মধ্যে দেশ-প্রেমের সমান অনুভূতি তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হন নি। ফলে এদের কেউ কেউ তাঁর মহত্বকে পূঁজি করে স্বার্থ উদ্ধার ও দেশের ক্ষতি করেছে। এসব সত্ত্বেও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন বাঙ্গালি জাতিকে দিশাহীন ছন্নছাড়া অবস্থা হতে উদ্ধারের নিরলস চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের প্রথম প্রহরে এক সামরিক অভ্যুতথানে ধানমন্ডীর বাসভবনে তিনি নিমর্মভাবে সপরিবারে নিহত হন।

সারকথা: *মানবসভ্যতায় বিকাশ প্রক্রিয়ায় এক এক জন যুগস্রষ্টার আবির্ভাব সমাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। এসব মনীষীর জীবনকথা সমাজের অগ্রগতিতে তাঁদের ভূমিকা উদ্ভাসিত হয়; আবার জনগোষ্টিগুলির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিকসমূহেরও উন্মোচন ঘটে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তেমন এক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কৃতজ্ঞ দেশ এই মহান নেতাকে জাতির পিতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য বাঙালি জাতি তাঁর কাছে ঋণী।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। শেখ মুজিবুর রহমান কবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ?
(ক) ১৯৩৯ সালে; (খ) ১৯২০ সালে; (গ) ১৯৪২ সালে; (ঘ) ১৯৪৭ সালে।

২। ১৯৪৯ সালে কোন স্থানে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয় ?
(ক) শাহবাগ হোটেল; (খ) রোজ গার্ডেন; (গ) ইডেন হোটেল; (ঘ) বাহাদুরশাহ্ পার্ক।

৩। ১৯৫৫ সালে শেখ মুজিবের প্রকাশিত প্রচার পুস্ড়িকার নাম-----
(ক) সোনার বাংলা শশ্মান কেন ? (খ) ছয়দফা- আমাদের বাঁচার দাবী;
(গ) কেন পূর্ববঙ্গের অটনমি চাই; (ঘ) পাকিস্ড়ান সৃষ্টির যৌক্তিকতা।

৪। ছয়দফা কর্মসূচী প্রথম কোথায় উত্থাপিত হয় ?
(ক) লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে; (খ) প্রেসিডেন্ট আইউবের দপ্তরে;
(গ) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে; (ঘ) সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিতে।

৫। শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করা হয় ------
(ক) আওয়ামী লীগের সভায়; (খ) গোলটেবিল বৈঠকে;
(গ) রেসকোর্স ময়দানের জনসভায়; (ঘ) বাংলাদেশের গণপরিষদে।

৬। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শাসন কাজ নির্বাহের জন্য বঙ্গবন্ধু ৩৫টি বিধি জারী করেন-----
(ক) ৩ মার্চ ১৯৭১; (খ) ৭ মার্চ ১৯৭১; (গ) ১৫ মার্চ ১৯৭১; (ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১।

৭। পাকিস্তানের কারাগার হতে বঙ্গবন্ধু কবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ?
(ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১; (খ) ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১; (গ) ৭ মার্চ ১৯৭২; (ঘ) ১০ জানুয়ারী ১৯৭২।

৮। বঙ্গবন্ধু নিহত হন----------
(ক) নিজ বাসভবনে (খ) টুঙ্গিপাড়ায় (গ) লন্ডনের রাজকীয় হাসপাতালে (ঘ) নিজ অফিসে।

উত্তর : ১. গ, ২. খ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. গ, ৬. গ, ৭. ঘ, ৮. ক।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. *Mound Ahmed, Bangladesh : Era of Sheikh Majibar Rahman, Dhaka, UPL, 1983*
2. *Lawrenec Ziring, Bangladesh From Majib to Ershed : An Interpretive Study, Dhaka: UDL, 1994*